সংবাদমন্থনের পর্যালোচনা সভা

স্থান বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর
(গাছতলা), বড়তলা, কলকাতা ১৮।
১৯ আগস্ট রবিবার বেলা দুটোয়

যোগাযোগ জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)
পাঠক, পত্রিকা কর্মীরা সবাই আসুন

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 2 16 July 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৬ জুলাই ২০১২ সোমবার ২ টাকা

• পানিফল পৃ ৩ • কলের মুখ পৃ ৩ • মৌমাছি পৃ ৩ • রাওয়াতভাটা পৃ ৩ • মহড়া পৃ ৩ • মৎসপুরাণ পৃ ৪ • ওয়ালমার্ট পৃ ৪ • ভর্তির সমস্যা পৃ ৪

উচ্ছেদের হাতছানি

উচ্ছেদ হতে হয়নি আপাতত, কিন্তু সরে যেতে হয়েছে রাস্তার মোড় থেকে অনেকটা ভেতরে। যাদবপুর থানা থেকে সাত আটটি দোকান, খাবারের দোকান থেকে শুরু করে পান বিড়ি সিগারেট — সবই। তার সাথেই ভাঙা পড়েছে সিপিএমের একটি অফিসও, পাকা গাঁথনির। আর নতুন জায়গায় দোকানগুলি বসার পরই তাতে টাঙানো হয়েছে তৃণমূলের পতাকা। দোকানিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাস্তা বাড়বে, তাই সরে যেতে বলা হয়েছে তাদের। কাছেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের কাছে যে দোকান রয়েছে, সেগুলিকে হুমকি দিয়ে গেছে 'প্লেন ড্রেসের পুলিশ', দোকান ছোটো করতে হবে। মাথার ওপর প্লাস্টিক লাগানো চলবে না। দোকানদার এক যুবক বললেন, 'হকারদের ওপর খুব অত্যাচার চালাচ্ছে এরা'। ছবি শমীক সরকার, ১৫ জুলাই।

কলকাতার সব বস্তি তুলে ফ্ল্যাট, জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার চায় পুরসভা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ১১ জুলাই •

কলকাতা শহরকে বস্তিমুক্ত করার এক মেগা প্রকল্প হাতে নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এই প্রকল্পে কলকাতার সব বস্তি তুলে দিয়ে সেখানে ফ্ল্যাট করা হবে। যে জায়গায় বস্তি রয়েছে, তার চল্লিশ শতাংশে হবে বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট। বাকি কুড়ি শতাংশে ফ্ল্যাটের আবাসিকদের জন্য পার্ক বা আমোদ প্রমোদের জায়গা বানানো হবে। আর বাকি চল্লিশ শতাংশ বাণিজ্যিক কাজে লাগাবে পুরসভা। শহর কলকাতায় নথিভুক্ত ১৫৭৬টি বস্তি রয়েছে। সেখানে এক হাজার একরের বেশি জমি রয়েছে, জানিয়েছেন বস্তি বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

'রাস্তার খাবার' দোকানের বিরুদ্ধে জেহাদ কেন্দ্রের

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ১১ জুলাই •

রাস্তার খাবার অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে। তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমজনতা। তাই রাস্তার খাবারের 'মান' একটি মাপকাঠিতে বেঁধে, সেই মাপকাঠি পালনে স্থানীয় প্রশাসনকে ফুটপাথের খাবারের দোকানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হবার ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী কে ভি থমাস। সম্প্রতি কলকাতায় এসে একথা শুনিয়েও গেছেন তিনি। তবে তিনি একথাও বলেছেন, রাস্তার খাবারকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে চাই না! কিন্তু, রাস্তার খাবার কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তা তো সবাই দেখতে পায়, আর বড়ো বড়ো রেস্টুরেন্টে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা তো কেউ দেখতে পায় না। সেখানে যে অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে খাবার তৈরি হচ্ছে না, তা কীভাবে বোঝা গেল?

চাষির চোখে সবজি বাজার

'মদনপুর বাজার যখন শুরু হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল, 'চাষির মাল চাষিই বিক্রি করবে' ... '

নদীয়া জেলায় ফুলকপি আর শীতের অন্যান্য সবজির জন্য বিখ্যাত মদনপুরের মাজদিয়া গ্রামের ছোটো চাষি বাসুদেব পরামাণিক–এর সাথে কথোপকথনে শমীক সরকার ও সম্রাট সরকার। বাসুদেবের কথা সম্পাদনা করেছেন শমীক সরকার। বাসুদেবের ছবি প্রতিবেদকের তোলা, মদনপুর, ১৪ জুলাই •

এবার দশ–পনেরো দিন আগে সবজির একটু বেশি দাম হয়েছিল। চাষিরা পেয়েছিল একটু। কারণ তখন মার্কেটে মালটাই কম ছিল। এখন এক বিঘে জমিতে চাষি দশ মণ করে পটল তুলছে, সপ্তাহে। ওই সময়টাতে এক মণও হত না। সবজির এত ক্রাইসিস হয়ে গিয়েছিল। একটা কারণ তো ছিল, ব্যাপক খরা। তাছাড়া সবজি টবজি এমন জিনিস, আমি দেখি, একসাথেই হয় সব। যখন হবে তখন সবার একসঙ্গে বিশাল হবে। আবার ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। যখন ক্রাইসিস থাকে, তখন দামটা বাড়ে। কিন্তু চাষিরা যা দাম পায়, বাজারে তার থেকে ডবলেরও বেশি দাম থাকে।

আমি এবার পটল লাগিয়েছিলাম। ভালো হয়নি খুব একটা। এবারে সবচেয়ে বেশি দাম ছিল ১৩০ টাকা পাল্লা (৫ কেজি)। গতবারে বর্ষার পরে, বন্যার পরে পটল বিক্রি করেছিলাম সবচেয়ে বেশি ২৩০ টাকা পাল্লা। অর্থাৎ কেজিতে দাম পেয়েছিলাম ৪৬ টাকা। সেই পটল বাজারে বিক্রি হবে ৬০ টাকা কেজি। পটলের দাম সবথেকে বেশি হয় ওই আগস্টের শেষের থেকে অক্টোবরের শুরু অবধি। ওই সময় ভাদ্র মাস, রোদটাও খুব প্রখর হয়। সেই সময় দিনের বেলা এক পশলা ভালো বৃষ্টি হলেই পটল পচে যায়।

এখন মদনপুর বাজারে বেগুনের দাম চাষিরা পাচ্ছে তিন টাকা কিলো। এবার বেগুন বেশি উঠেছে। একমাস আগে জমিতে বেগুন খুঁজতে গেলাম বাড়ির জন্য, সাত–আট কাঠা জমিতে দুটো মাত্র বেগুন পেলাম, তাও একটায় পোকা। সেই জমিতেই এখন পাঁচ মণ বেগুন (২০০ কেজি)। কাঁচামালের ব্যাপারটা না, সিজনে কিছু মাল প্রচুর উঠে পড়ে। কপি যে যতই আগে বুনুক, সেই একই সময়ে সবার ফুটবে। আর দামটা কমে যাবে। চাষিও মনে করে, আমি তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে পারলে বাঁচি, লস লাভের হিসেব করে লাভ নেই। চাষিদের অনেক সমস্যা।

আমরা পাল্লা হিসেবে যা বিক্রি করি, তা যদি সরাসরি বাজারে যায়, তাহলেও একটা দামের ফারাক হবেই। আমি পাঁচ কিলো দিয়েছি। তার মধ্যে থেকে কিছু পাকা, পোকা, ছোটো মোটোও বেরোবে। আমি পাঁচ কিলো (দাঁড়িপাল্লার) যে ঝুলে দিয়েছি, সে তো দুশো–আড়াইশো করে দেবে, পাঁচ কিলো তার পুঁজবে না। তবে আমরা ঝুলে কম দিই না, কিন্তু এমন চাষিও আছে, সাড়ে চার কিলো মাল ঝুলে পাঁচ কিলো করে দিল। ভালো খারাপ সব আমাদের মধ্যেও আছে।

আমি নিজে বিক্রি করছি, আর নিজেই যখন কিনতে যাচ্ছি, ডবল দাম। চাষিরা কত বোকা দেখ। কেউ লঙ্কা নিয়ে গিয়েছে পাঁচ কুইন্টাল। বাড়িতে একমুঠো লঙ্কা রেখে যায়নি। আমার নিজের চোখে দেখা। সেই লঙ্কাই সে কিনছে দোকান থেকে ডবল দাম দিয়ে। ভোরে মাঠ থেকে বাজারে যাওয়ার সময় লঙ্কা রেখে যায়নি বাড়িতে। এরকম পরিবার অনেক আছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তো আরেকবার মাঠে গিয়ে দুটো গাছ ছিঁড়ে নিয়ে আসলেই তো হয়। বলে, অত সময় নেই, বাড়িতে রান্না বসাবে। আমি সবসময় বাড়িতে বেশি বেশি করে রেখে যাই।

এরপর দুয়ের পাতায়

দুই ম্যানেজারের মাসিক বেতন কোম্পানির বাকি লেবারদের মোট মাইনের চেয়ে বেশি

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১ জুলাই •

দেড় মাস আগে প্লাস্টিক কারখানায় প্রথম ঝামেলা শুরু হয়। যে প্রোমোজিনে লেবাররা প্রথম বিক্ষোভ দেখায় সেখানে জুন মাসে বেতন দেবার সময় মালিকপক্ষ আবার ১৪৫ টাকাই হাতে দিতে চায়। এবারেও অনেকে নেয়নি। তাতে কিছুটা বাধ্য হয়েই ১৬০ টাকা দিয়েছে, যদিও নকশা করতে ছাড়েনি,বলেছিল অন্য কোম্পানি দিক, তবে দেব। শেষ পর্যন্ত ১৬০ টাকা দিয়েছে। অথচ এই ফলতাতেই মাঠের কাজে কলাতলাহাট অঞ্চলে মজুরি পড়ছে ১৭০–১৮০ টাকা করে।

এই স্পেশাল ইকনমিক জোনের আরেকটা কারখানা দাত্রে করপোরেশন। কাস্টিং–এর কাজ হয়, গত ২ মাস ধরে কাজ বন্ধ। এখানকার (দক্ষ) লেবারদের কথা অনুযায়ী তাদের পাওয়ার কথা ১৯৪ টাকা, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে ১২০–১৩০ টাকা। এরা যেহেতু দক্ষ অর্থাৎ আইটিআই পাস আর মেশিন অপারেট করতে করতে আরও দক্ষতা বেড়েছে তাই কোম্পানিও জানে দুম করে এদের বাদ দিয়ে কাজ চালানো সহজ নয়। এদের সাথে কন্ট্রাক্টে কাজ করে এমন লেবারদের একটা অংশও আছে। এরা মূলত অদক্ষ শ্রমিক, তাই তাদের জোরের জায়গাটাও কম। এদের কয়েকজন বেকারিত্ব সইতে না পেরে কাজে যোগ দিয়েছেন। এরা সবাই আইএনটিটিইউসি–র ব্যানারেই আছে। এরকম কারখানায় কাজ করেন এমন একজন অদক্ষ শ্রমিকের সাথে কথা বলে জানা গেল, মাঝে ডায়মন্ড হারবারে লেবার কমিশনারের অফিসে মিটিং হয়েছে, কিন্তু লেবার কমিশনারের বক্তব্য হল, আমি বললেও কিছু হচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে দোলা সেন (আইএনটিটিইউসি–র) এই সমস্যাটা দেখবেন। অদক্ষ শ্রমিকরা চাইছে ১৭০ কিন্তু কোম্পানি ১৫০ পর্যন্ত দিতে রাজি।

যাঁর বাড়িতে বসে এসব কথা হচ্ছিল তাঁর ঘরের পাশ দিয়েই হুগলী নদী বয়ে চলেছে। যখন কথা চলছে, পাশেই তখন বোটঘাটের কাজ চলছে। ইনিও একসময় বোটের কাজে যুক্ত ছিলেন, তাতে ঝড়–জলে রিস্ক বেশি তার তুলনায় মাছ সেরকম পড়ে না, তাই প্রথমে আইসিআই কোম্পানিতে ঢোকেন, বেশ কয়েকবছর কাজ করার পর কারখানাটা বন্ধ হতে আবার বোটের কাজ, মাঠের কাজে নামেন, এরপর এলপি কোম্পানিতে আবার কাজে ঢোকা আবার বছর কয়েক বাদে তা বন্ধ হয়ে যায়, আবার আগের কাজে ফিরে যাওয়া, তার পরে এই কোম্পানিতে কাজে ঢোকা। এই কোম্পানিটায় দুটো ম্যানেজার আছে যাদের মাইনে নাকি ৬০,০০০/৭০,০০০ টাকা, এই দুই ম্যানেজারের মোট মাইনে বাকি লেবারদের মোট মাইনের থেকে নাকি বেশি। গতবছর খোরোতে চাষ করেছিলেন লাল স্বর্ণ, তার আগের বছরের কেনা ধান, তা থেকেই বীজ তৈরি করে চাষ করে এমন লস খেলেন এবারে আর ওমুখো হননি। তার মধ্যে কারখানা বন্ধ হল। এখন এবারে আর থাকতে না পেরে স্ত্রী এই জোনে অভ্র তৈরি করে এমন একটা কারখানায় ঢুকেছেন। ১২০ টাকা রোজ, সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যেটা তাহল, এরা সপ্তাহের রোজের টাকাটা সপ্তাহেই দিয়ে দেয়। এইসব কথা যেখানে চলছে তার পাশেই বোটের কাজ চলছে,তার ঠুকঠাক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর এদিকে এই লেবারটির বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটি একটি শোলার বোট তৈরি করে তার মেরামতিতে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

ফলতা সেজ–এর হকিকত ৩

পিছু হটছে সেজ

আমাদের দেশের সেজ বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গুলি থেকে রপ্তানি কমছে। সরকারি পরিসংখ্যান তেমনই বলছে। তাই সরকার থেকে এই অঞ্চলগুলি, যেগুলি এখনই প্রায় কোম্পানিগুলির রামরাজত্ব, সেখানে কোম্পানিগুলিকে আরও বেশি সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। বেশ কিছু সেজ স্বীকৃতি পেলেও কাজ শুরু করেনি কোম্পানি। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা সম্প্রতি এরকমই জানিয়েছেন। করবিহীন এইরকম ১৫৩টি সেজ থেকে ২০১০–১১ সালে রপ্তানি হয়েছিল দেশের মোট রপ্তানির তিরিশ শতাংশ, এবছর তা কমে দাঁড়িয়েছে দেশের মোট রপ্তানির বারো শতাংশে। এই সেজগুলিতে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ লোক কাজ করে বলে সরকারি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে।

আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভয়াবহ বন্যা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৫ জুলাই •

প্রতি বছরের মতো এবারও আসামে বন্যা হয়েছে, তবে এবারের বন্যা এক দশকের মধ্যে ভয়াবহ। ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলির জল উপচে গিয়ে আসামের সাতাশটি জেলার অন্তত চব্বিশ লাখ মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছে। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের সরকারি হিসেবে এখনও অবধি একশো চব্বিশ জন মানুষ মারা গেছে বন্যায়, আরও ষোলো জন মারা গেছে ধসে। বেশ কিছু মানুষ নিখোঁজ। চার হাজার পাঁচশো চল্লিশটি গ্রাম ভেসে গেছে, মোট সাড়ে নয় লক্ষ হেক্টর জমি জলের তলায়, যার মধ্যে আড়াই লক্ষ হেক্টর চাষজমি। কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের সাড়ে পাঁচশো জন্তু বন্যায় মারা গেছে। লামডিং–বদরপুর রেলওয়ে ভূমি ধসে বন্ধ রয়েছে। প্রায় তিন হাজার জায়গায় সড়ক বন্ধ, রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। অন্তত পাঁচ লক্ষ মানুষ সরকার পরিচালিত ছ–শো তিরিশটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। গবাদি পশু রাখার জন্য তিরিশটি ক্যাম্প করা হয়েছে। বন্যা হয়েছে বরাক উপত্যকাতেও।

ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলি উপচে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর বিশ্ববিখ্যাত চর মাজুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনিতেই নদী ভাঙনে মাজুলি চর অর্ধেক হয়ে গিয়েছে গত তিরিশ বছরে (১২২৬ বর্গকিমি থেকে ৫৭৬ বর্গকিমি)। দ্বীপটিকে ঘিরে থাকা যে বাঁধ, তা সোনোয়াল কাছারিতে ভেঙেছে। অনেকের মতে পাকাপোক্ত বাঁধ দেওয়াই সমাধান। কিন্তু ইউনেস্কো সহ অনেকের মত, বাঁধ থাকাই উচিত নয়। প্রতি বছর কিছুটা জল উপচে গিয়ে আবার নেমে যাবে, সেই বরং ভালো। কিন্তু বাঁধ দিলে সেই বাঁধ ভাঙবে যখন, গোটা এলাকা প্লাবিত হবে ভয়াবহভাবে, যা এবারে হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য এই দ্বীপ থেকে মানুষ সরিয়ে আনার কথাও বলেছে।

তবে বন্যা আটকানোর জন্য নদীখাত গভীর করার কথা উঠছে। আসামের ওপরদিকের সাদিয়া থেকে ধুবড়ি অবধি ব্রহ্মপুত্র এবং তার ১২৬ টি উপনদী ড্রেজিং করে নদীখাতের বালি দূর করার পরিকল্পনার কথা বলছে কেউ কেউ। কিন্তু অনেকেরই মতে, এই পদ্ধতি খরচসাপেক্ষ এবং বাস্তবোচিত নয়, কারণ নদীতে পলির পরিমাণ বিশাল। অপরদিকে কেউ কেউ ব্রহ্মপুত্র দিয়ে জাহাজ চালানোর পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে তার দরুনই নদীখাতের মাঝখানটা গভীর হয়ে যায় আপনা থেকেই।

আসামের বন্যায় নদীর ওপর বড়ো বড়ো জলাধার ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমিকার কথাও উঠছে। গত বছর অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়গুলোতে বন্যার ফলে সংলগ্ন আসামের ধেমাজি, লখিমপুর, শোনিতপুর জেলা এবং জোরহাট ও বারপেটার কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। তখন অনেকেই বলেছিল, অরুণাচল প্রদেশের রাঙ্গা নদী, যার আসামে নাম দিকরঙ, সেখানে ৪০৫ মেগাওয়াটের একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণেই এইসব এলাকায় প্রতি বছর বন্যা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এই লখিমপুর জেলাতেই সুবণসিরি নদীর ওপর যে ২০০০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হচ্ছে, তা ব্রহ্মপুত্র নদীতে বার্ষিক অন্তত দশ শতাংশ জল সরবরাহ করে।

সম্পাদকের কথা

চাষ করে লাভ নেই

গত শীতে কোচবিহার শহরের অদূরে চাষিরা বাসে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল, মরশুমে আমন ধানের দাম না পাওয়া নিয়ে। খরচ বাড়ছে চাষের, অথচ দাম নেই। একজন চাষি বলে উঠেছিল, এবার থেকে চাষিদের নিজেদের খোরাকির জন্যই কেবল চাষ করা উচিত। আর বাজারের জন্য করতে পারি, যদি সরকার টাকা দেয়।

কেবল বাড়ির জন্য ধান চাষের কথা এবার বোরোর মরশুমে আরও ব্যাপকভাবে শোনা গেছে। এক চাষির কাছে শোনা গেল, এবারে যাওবা বিক্রির জন্য করেছি, সামনে বারে শুধু খাওয়ার জন্যই করব। কেউ কেউ জমি চাষ না করে ফেলে রাখার কথাও বলেছে।

চাষ করে বড়োলোক হওয়ার স্বপ্নে ইতি টানছে ছোটো চাষি, সেকথা হয়তো এখনই বলা যাবে না। কিন্তু বাজারের জন্য চাষের যে দাপট গত কয়েক দশক ধরে দেখা গেছে, তা কমছে। সার, জল, ওষুধ, লেবারের বাড়তি চাহিদা এবং অগ্নিমূল্যের কারণে চাষের খরচ, বিশেষত ছোটো চাষির, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জমিটা বিক্রি করে দেওয়ার বদলে অন্যান্য আরও অনেক সম্ভাবনার দিক খুলছে তার কাছে।

সরকারও যে চাষিকে বড়োলোক হওয়ার খোয়াব দেখাতে পারছে, তা নয়। বরং প্রতি বছর সারের ভরতুকি কমিয়ে চলেছে। বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চলেছে। যে কোনো ফন্দি ফিকিরে জমি অধিগ্রহণে লাগাম টানেনি। একশো দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে কার্যত চাষে লেবারের দাম বেড়েছে। কোনো উপায়েই ফসলের দামের ওপর মিডলম্যানদের নিয়ন্ত্রণ আলগা করা যায়নি। বিভিন্ন চাষজাত পণ্যের আগাম বাণিজ্য চালানোর সুযোগ করে দিয়ে ফসলের দামের ওপর চাষির নাগাল কমিয়ে চলেছে। সম্প্রতি পঞ্জাব-হরিয়ানার ভূগর্ভস্থ জলে তেজস্ক্রিয় মারণ কণা ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে বলে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ স্বীকার করেছেন। সমাজকর্মীদের অভিযোগ, জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কারণে ভূগর্ভস্থ জলে এই তেজস্ক্রিয়তার আবির্ভাব। সব মিলিয়ে, বাজারের জন্য চাষ করে চাষির 'উন্নত' হওয়ার আশায় সরকারের কোনো মদত নেই।

এরই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সাম্প্রতিক হতাশাভরা লিখিত উক্তিতে — '... আমার দুশ্চিন্তা, উন্মুক্ত অর্থনীতির সুফল আরও বেশি বেশি করে অল্পসংখ্যক লোকের হাতেই যাবে। আমাদের জনগণের একটা বড়ো অংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপকারের আওতার বাইরে চলে যাবে।'

প্র থ ম পা তা র প র

'... মদনপুর বাজারের বেশিরভাগটা আড়তদারদের হাতে চলে গেছে'

মদনপুর বাজার যখন শুরু হয়েছিল, তখন লেখা ছিল, 'চাষির মাল চাষিই বিক্রি করবে'। যে উৎপাদন করবে, সে-ই বিক্রি করবে। কিন্তু এখন উলটো হয়ে গেছে।

মদনপুর বাজারটার বেশিরভাগ জায়গা আড়ত হয়ে গেছে, লোকে রাজনৈতিকভাবে দখল করে নিয়েছে। এই নিয়ে মদনপুরে অনেক মিছিল মিটিং হয়েছে। চাষিরাই করেছে। কিন্তু চাষিদের ভেতরে ইউনিটি (একতা) নেই। আমিও ছিলাম আন্দোলনে। সামনের সারিতেই ছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক বড়ো বড়ো নেতারা দেখল, তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করছে উঠতি বয়সের কিছু ছেলে। তাই আমাদের ডাউন করার জন্য আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখল না। আমাদেরকে আর পরে কোনো মিটিং-টিটিঙে ডাকল না। ওরা ওরাই সব করে ফেলল। আমরা হেরেই গেলাম। আমাদের পাড়ারও দু-একজন ওইরকম নেতা আছে।

মদনপুর বাজারে কেবল মাজদিয়া গ্রামের কোনো চাষি আড়তে বিক্রি করে না। বাদবাকি আলাইপুর, সগুনা, বামুনপাড়ার সব চাষি আড়তে দেয়। মদনপুর বাজারটা সব দখল হয়ে গেছে। শুধু আমার বারান্দাটা নিয়ে আর এই ঘর দুটো নিয়ে যতটা জায়গা, তার সমান জায়গায় মাজদিয়ার চাষিরা বসে, সরাসরি বিক্রি করতে পারে, দখল হয়নি। এবার ধরো, আমার সগুনার দুটো চাষি বন্ধু হয়ে গেছে, তারাও এল, এই জায়গাটায় বসল। এই জায়গাটুকুর ওপর এখন সব জায়গার চাষির নজর, জানে এখানে বসলে পয়সা দিতে হবে না।

বাজারের জায়গা যারা দখল করে আড়ত করে বসে আছে, তারা যে সবসময় কেনে, তা নয়। অনেকসময় দেখা যায়, ওদের আট ফিট বাই আট ফিট বা দশ ফিট বাই দশ ফিট জায়গা আছে। তুমি বিক্রি করো। আমাকে কিছু দাও। কত? কিছু কিছু আড়তদার একশো টাকায় দশ টাকা নিয়ে নেয়। কিছু কিছু আবার ঝুড়ি অনুযায়ী। এই ঝুড়িটার এই রেট। আড়তদার কিন্তু মাল যাতে বিক্রি হয় সে ব্যাপারেও কোনো দায়িত্ব নেবে না। শুধু মালটা রাখার জন্যই টাকা।

মদনপুর বাজারে যারা রাত একটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত মাল কেনে, তারা কোলে মার্কেটে (শিয়ালদা) নিয়ে যায়। তারা অনেক মাল কেনে। এরা পাইকার। ট্রেনে করে নিয়ে যায়। ওই সময় যত ট্রেন যায়, তারা মদনপুরে দু-এক মিনিট বেশি দাঁড়ায়। ওই সময় কোনো প্যাসেঞ্জার থাকে না। পুরোটা মালগাড়ি। যারা কোলে মার্কেটের জন্য কেনে, তারা আমাদের (চাষিদের) কাছ থেকে কিনলে ক্যাশে কেনে। কিন্তু আড়তদারের কাছ থেকে কিনলে অনেক সময়ই ধারবাকি হয়।

তারপর যারা কেনে, তারা লোকাল। মানে কল্যাণী, চাকদা। তারা ছোটো ছোটো গাড়ি, যেমন ১৬০ (ছোটো মালবাহী গাড়ি), বা কেউ ভ্যানরিক্সা করেও নিয়ে যায় আশেপাশের বাজারে। এরা খুচরো। এরা ডাইরেক্ট পাবলিককে খাওয়াচ্ছে। ওরা বেশিটা কেনে না। ...

... ফসলের বাজার ফড়েদের ওপর নির্ভরশীল

আবার যাকে আমি সরাসরি মাল বিক্রি করছি, সে সবজিবিক্রেতা না হয়ে ফড়েও হতে পারে। আমার কাছ থেকে মাল কিনে নিয়ে অন্য কাউকে বেচে দিল। যেমন ধর, গতবার আমি লঙ্কা নিয়ে গিয়েছি একদিনে পাঁচ কুইন্টাল (৫০০ কেজি)। এবার আমার কিন্তু একটা ভয় আছে। পাঁচ কুইন্টাল লঙ্কা আমি একা বিক্রি করতে পারব না। ধরা যাক, আমি রাত দুটোর সময় গেলাম, ভোর ছ-টা সাড়ে ছ-টা অবধি খরিদ্দার থাকে, যেই সেই টাইমটা পার হয়ে গেল, আমি কেঁদে ফেলব। মাল বিক্রি না হলে নষ্ট হয়ে যাবে তো। তখন কোনোরকমে দিয়ে-টিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। তাই বেশি মাল নিয়ে গেলে, রাত্রিতে গিয়ে প্রথমেই ওদেরকে (ফড়েদের) দিয়ে দিলাম, যে পারব না আমি একা অত মাল বিক্রি করতে। এবার তখন টাকা দেবে না। আমি তো ওদের মালটা দিয়ে বাড়ি চলে আসলাম, কি আবার ভুঁইয়ে গেলাম, অন্য মাল নিয়ে আবার গেলাম বাজারে। তখন আমার মালটা ওরা বিক্রি টিক্রি করে ফেলেছে, তখন টাকা দিল।

সবজির দাম কিন্তু ঠিক করি আমরাই। এক চাষি যখন বাজার থেকে ফেরে, তখন যে চাষি মাল নিয়ে যাচ্ছে, পথে জিজ্ঞেস করবেই, বাজার কেমন? আজ সকালে আমি পটল বিক্রি করেছি পঞ্চাশ টাকা পাল্লা, মানে দশ টাকা কিলো। এবার কালকে গিয়েও আমি একই দাম চাইব। বা পঞ্চান্ন টাকা পাল্লা চাইব। এটা দীর্ঘদিন যে চাষি মাল বাজারে নিয়ে যায়, তার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মালের যখন চাহিদা হয়, তখন আমি যখন মালটা নামাচ্ছি তখন একসাথে পাঁচটা খরিদ্দার এসে বলবে, দাও আমি নামাচ্ছি আমি নামাচ্ছি। সবাই জিজ্ঞেস করবে, কত। তখন আমি বুঝতে পারলাম, আজকে চাহিদা আছে মালটার। তখন একটু বাড়িয়ে বললাম। এবার যেদিন মাথা থেকে ঝুড়ি নামানোর সময় ধরার লোক পাচ্ছিনে, কোনো খরিদ্দার এসে জিজ্ঞেস করছে না যে কত, বোঝা গেল যে আজকে হবে না। সেদিন আমি বুঝলাম, কালকে পঞ্চাশ দিয়েছি, আজকে চল্লিশ হলেই বাঁচি।

এখন সব থেকে বেশি আপ ডাউন হচ্ছে লঙ্কার বাজার। আজকে লঙ্কা দুশো টাকা পাল্লা। এবার ধর, চাকদায় আজকে বিক্রি হয়েছে দেড়শোটাকা পাল্লা। কালকেই দেখবি মদনপুরে লঙ্কা ভর্তি হয়ে যাবে। লরি লরি লঙ্কা চলে আসবে মদনপুরে। কালকে আর লঙ্কার খরিদ্দার পাওয়া যাবে না। তুই শুনলে বিশ্বাস করবিনি, লঙ্কার দাম যখন মদনপুরে আড়াইশো টাকা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তখন এক ধরনের খরিদ্দাররা ফোনে ফোনে সব বাজারে জিজ্ঞেস করে নেয়, চাকদায় কত। সব দালাল আছে। ফোনে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, সব মাল কিনে ফেল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট একঘন্টার মধ্যে গোটা মদনপুর বাজার লঙ্কায় ভর্তি হয়ে যাবে। ট্রেনে দশ পনেরো মিনিট সময় লাগে। বস্তা বস্তা আসবে পরের ট্রেনেই। যেদিন চাকদায় রেট বেশি, মদনপুর থেকে সব মাল তুলে নিয়ে চাকদায় চলে যায়। চাষিরা কিন্তু এটা করতে পারে না, যে চাকদায় আজকে দাম বেশি, আমি চাকদায় নিয়ে চলে গেলাম। ক্ষমতাও নেই। সে মাঠে যাবে, না চাকদায় যাবে? তাছাড়া, তার কোনো সরঞ্জামও নেই। আর ওদের লরি, ছোটো গাড়ি সব রেডি। সবকিছুরই দালাল আছে। ফোনে ফোনে সব খবর হয়ে যায়। চাষি কোনোদিন ফোন টোন নিয়ে বাজারেও যায় না, অত সময়ও নেই। কিন্তু ওদের কাছে সব খবর আছে। কোলে মার্কেটেরও খবর আছে। এরা ঠিক আড়তদারও নয়। এদেরকে বলে ফরিদ খরিদ্দার, ফড়ে। এরা খুব চালাক। ...

'... যেই মমতা চাপ দেবে, অমনি ফড়েরাও চাষিদের দাম কম দেবে'

মমতাও চাষিদের উপকার করতে পারবে না। আমাদের ছোটো মাথায় এমনই বলে। মমতা ওখানে বসে যা করছে, সব আমলাদের কথা শুনেই তো করছে। চাষিদের সাথে ওর যোগাযোগ নেই। আর যেসব চাষির সাথে যোগাযোগ করেছে, তারা সব আমাদের মতো চাষি না, উঁচু চাষি। হয়ত তার একশো বিঘে জমি আছে, চাষ করছে দশজন। তার সাথে যোগাযোগ করেছে। একদম নিচু লেভেলে না এসে এসব ব্যাপার বুঝতে পারবে না। মমতা যে পলিসি করেছে, তাতে হবে না। আজকে ফড়েরা যে দামে চাষির কাছ থেকে কিনছে, তার ডবল দামে বিক্রি করছে। কিন্তু যেই মমতা চাপ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ফড়েরাও দাম কম দেবে। বলবে, কিনব না মাল। এবার আমি ধর কুড়ি কিলো মাল নিয়ে গিয়েছি। সাতটা বেজে যাচ্ছে, খরিদ্দার পাচ্ছি না। ওরা একটা রেট বলছে, যা খুব কম। আমি হয়ত পঞ্চাশ টাকা পাল্লা পেলে বিক্রি করে দেব। ওরা বলল, তিরিশ। দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে এসে ওরাই পঁচিশ টাকা পাল্লা বলা শুরু করল। তখন আমি চমকি খেয়ে যাব। এই মরেছি আমি। এই রকম লস আমরা মাঝেমাঝেই খাই। প্রত্যেকের সাথে এটা হয়। এবার আজকে ধর এটা হল। কালকে আমার মানসিকতা দাঁড়াবে, যা পাব প্রথমেই, তাতেই বিক্রি করে দেব। পরদিন চল্লিশ বলাতে বিক্রি করে দিলাম। পরে শুনলাম, আজ বেশি দাম গেছে। এবার মমতা যদি বেশি চাপ দেয়, তাহলে সব খরিদ্দার, ফড়ে আর খুচরো ব্যবসায়ী, সব এক হয়ে যাবে।

একটা যেটা করতে পারে, মাল ডাইরেক্ট বাজারে বেচা-কেনা করতে হবে। চাষিদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। একটা প্রশাসনিক লোক থাকবে। কার কাছ থেকে মাল কিনেছ, সেটা খরিদ্দারের কাছে লেখা থাকতে হবে। এবং কত দামে কিনেছে, কতটা কিনেছে, সেটাও। বাজার কমিটিও এটা করতে পারে। যেমন গরুর হাটে হয় বলে শুনেছি। মাঝে মাঝে তদন্ত করতে হবে, খরিদ্দারের কাছে প্রশাসনের কেউ এসে দেখতে চাইবে রসিদ। পালটা চাষির কাছ থেকেও জানতে চাইবে, খরিদ্দার ঠিক বলছে কিনা।

আমি পনেরো বিশ বছর বাজারে যাই। প্রথম থেকেই এই ফড়েদের দাপট দেখছি। তবে আগে এত ব্যাপক হারে ছিল না। মোবাইলের যুগ ছিল না। মনে কর, বেলডাঙায় লঙ্কার দাম কত চলছে, সেটা তিনদিন চারদিন পরে শুনতে পেত ফড়েরা। এখন এক মিনিট লাগছে। যার জন্য এখন ব্যাপক হয়। জায়গা ভেদে মালের দামও আলাদা। বেলডাঙার লঙ্কার যা দাম, মদনপুরের লঙ্কার অত দাম হবে না। আবার মদনপুরের কপির দাম সবচেয়ে বেশি থাকবে।

কমপিটিশন

এই যে খুচরো মার্কেটে বড়ো পুঁজির কথা আসছে, তাতে হয়ত প্রথমে চাষির ভালো হত। তারপরে খারাপ আছে। রিলায়েন্স যেমন বলছিল, চাষিদের কাছ থেকে ডাইরেক্ট মাল কিনব। মাঝে আর কিছু থাকবে না। ও একাই যা করবে। এতে ভোক্তাও কম পাবে দামে, চাষিরাও একটু বেশি পাবে। এই করতে করতে একসময় হয়ত দেখা যাবে যে যারা খুচরো মাল টাল কেনে, এরা আর থাকল না। এরা তো ওদের সাথে টেক্কা দিয়ে পারবে না। ক্ষমতা নেই। তখন ওরা যা দাম বলবে, তাই। ওরা তো আরেক ফড়ে। এখন তো তাও কমপিটিশন হচ্ছে। কোনো খরিদ্দার ভাবছে, আমি এক টাকা কেজিতে বেশি দিলেই ওই চাষি আমাকে দেবে। কমপিটিশন আছে। আমি যদি একটা ভালো মাল নিয়ে যাই, সেই মালটা কিন্তু কমপিটিশনে বিক্রি হচ্ছে। দাম বাড়ছে। এমনও দেখা গেছে, আমি চেয়েছি একঝুড়ি পঁচিশটা কপি হয়ত দুশো টাকা, কেউ হয়ত পটাং করে দুশো দশ টাকা বলে ফেলল। চাষি দেখল যে হয়েছে কায়দা। বলল, হবে না। আরেকজন বলল, তাহলে দে দুশো কুড়ি। এরকমভাবে হয়ত আড়াইশো টাকা দাম উঠে পড়ল। তবে সেটা কম। হয়তো বছরে একদিন এমন হয়। চাষিরা বাজারে যাওয়ার পথেই অন্য চাষিদের জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় বাজার কেমন। হয়তো জানল, অন্য সব বাজার খারাপ, বেগুনের বাজারটা ভালো। বা লঙ্কার দামটা আজ এত।

তবে এর থেকে ভুল বোঝাও হয়। একবার শীতকালে আমি লঙ্কা নিয়ে গেছি, শুনলাম লঙ্কার পাল্লা চলছে ষাট টাকা। আমি তাই বললাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলল, সব আমার। তারপর আমার কাছ থেকে নিয়ে, আমার ঝুড়ি, আমার পাল্লাতেই একশ' টাকা পাল্লা বিক্রি করে দিল। পাঁচ পাল্লা মতো ছিল। সেই ফড়ে খরিদ্দার দুশো টাকা লাভ করে চলে গেল। আমি পেলাম তিনশো টাকা। পরে শুনলাম, আইরেট লঙ্কার পাল্লা ষাট টাকা। আমি যে লঙ্কা নিয়ে গেছি, তা ভালো জাতের। দাম বেশি। ...

নোনাডাঙা উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের জামিন

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ৭ জুলাই • নোনাডাঙার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন থেকে ২০ জুন গ্রেপ্তার হওয়া ৩২ জন অবশেষে ৬ জুলাই জামিন পেলেন, প্রত্যেকে ব্যক্তিগত পাঁচশো টাকার বন্ডে। এর মধ্যে ২২ জন বস্তিবাসী, বাকিরা উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের কর্মী। একইসাথে গ্রেপ্তার হয়েছিল সুনীল কুমার গুপ্তা নামে একটি সতেরো বছরের কিশোর। সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। ধর্মতলা থেকে আন্দোলনকারীদের সাথে তাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং ওই মামলায় ফাঁসায়। সেও ওইদিন জামিন পায়। এই কিশোরের বাবা ধর্মতলার কাগজ বিক্রেতা হকার। বাড়ি ১৫এ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটে।

তবে এই ৩৩ জন জামিন পেলেও নোনাডাঙার ঘটনায় আগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিজ্ঞান সরকার এবং দেবলীনা চক্রবর্তী এখনও জামিন পাননি।

এদিকে ১৪ জুলাই পুরমন্ত্রী নোনাডাঙায় যান আবার। কিন্তু বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বিধা আছে, আপাত সরে যাওয়ার যে জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে, সেটি মজদুর কলোনি ও শ্রমিক কলোনির এখন পড়ে থাকা শ'খানেক পরিবারের থাকার পক্ষে খুবই ছোটো।

'... তবে শুধু চাষি থাকলেও বাজার চলবে না, ফড়ে-ব্যবসায়ী লাগবেই'

মদনপুর বাজারের একটা নাম আছে। নামের একটা কারণ, এটা রেলস্টেশনের পাশে। রাত একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত এখানে ব্যাপক মাল বিক্রি হয়। সারা বছর। ওইসময় মদনপুর স্টেশনে শুধু কালো মাথা দেখা যায়, এত ভিড়। ওই সময় কেউ কম মাল কেনে না। সব পাইকারি খরিদ্দার। মালও আসে দূর দূর থেকে। এখানে সুদূর বগুলা থেকেও মাল আসে। এক ব্যবসাদারের বাড়ি আমি গিয়েছিলাম, সে করে কি, দশ পনেরোটা চাষির কাছ থেকে মাল কিনে নিয়ে আসে মদনপুর বাজারে। সেখানে সে বিক্রি করে। ওর হাতে সেই চাষিরা। সে সন্ধ্যেবেলা ওদের সবার বাড়ি বাড়ি ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, জিজ্ঞেস করবে মাঠ থেকে কী মাল তুললি? কেউ বলল, এক মণ বেগুন আছে, কেউ বলল পাঁচ কিলো টমেটো আছে। সব তুলে নিল। পয়সা-টয়সা কিচ্ছু দিল না। বিক্রি করে ফেরত গিয়ে পয়সা দেবে। কত দামে সে বিক্রি করল, চাষিরা কিছু বুঝতেই পারল না। ও লস খেলে চাষিদের কিছুই পয়সা দেবে না, চাষিদের লস। কিন্তু লাভ করলে ওরই লাভ। কিন্তু বগুলার ওই চাষিদের অন্য কোনো উপায়ও নেই, ওর কাছে দেওয়া ছাড়া। সে তো দূরে কোনো বাজারে নিজে যেতে পারবে না, ওইটুকু মাল নিয়ে সেই বগুলা থেকে মদনপুরে আসা লস, সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট।

তবে আড়তদার, ব্যবসায়ী, ফড়ে না থাকলে বাজার চলবে না। এককালে মদনপুর বাজার যাতে চাষিদের হাতে থাকে, তার জন্য আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক, মদনপুর বাজারে যদি শুধু চাষিরাই বিক্রি করত, তাহলে এটার এত রমরমা হত না। কারণ, কোনো খুচরো বা পাইকারি খরিদ্দার যখন মদনপুর থেকে মাল কিনতে আসছে, সে চায় এখান থেকেই তার সব মাল কিনবে। কপি, পটল, টমেটো থেকে আদা, রসুন — সব। এবার মদনপুরের চাষিরা কী কী মাল তৈরি করতে পারে? পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, কপি এইসব। আমরা আদা তো আর করি না। আম এখানে কারও গাছে হয় না। এবার ব্যবসায়ী বা ফড়েরা এখানে সবকিছু নিয়ে আসে, ক্যাপসিকাম থেকে বিন, আদা রসুন পেঁয়াজ — সব এখানে নিয়ে চলে আসে। খুচরো বা পাইকারি খরিদ্দাররা মদনপুর বাজারে এসে সব পায়। এখান থেকে পটল, আর চাকদা বাজারে গিয়ে বিন কিনতে হয় না পাইকারি বা খুচরো খরিদ্দারদের।

১৯৯০ সাল নাগাদ এই নতুন মদনপুর বাজারটা তৈরি হয়েছিল। চাষিরা নিজের মনে করে বাজারটা করেছিল। কন্ট্রাকটরই করছিল, রেলের জমিতে, কিন্তু চাষিরা কেউ কেউ নিজেরাই কোদাল টোদাল নিয়ে মাটি কেটে দিয়েছিল এমনিই। তখন কেউ বুঝতে পারেনি এই অবস্থা হবে, বাজার আড়তদার আর ফড়েদের হাতে চলে যাবে। একসময় একটা চট পেতে বাজারে বসেছিল হয়তো কেউ, আড়ত করবে বলে। চাষিরা হয়তো মেরে তুলে দিয়েছে কয়েকবার। তারপর নেতারা বলেছে, ওকে তুলিস নে, ও আমাদের লোক, একপাশে থাক না। তারপর দশ বারো বছর পর সেই চটপাতা লোকই দশ চাকার লরি কিনে ফেলেছে দুটো তিনটে করে। কুমড়ো হয়তো নিয়ে আসছে পাঞ্জাব থেকে। তারা এখন চাষিদের চোখ রাঙায়, বলে, এই ওই মাল আমার আড়তে নিয়ে চল। এরকম করে প্রতিদিন বিশটা করে ঝুড়ি যদি আসে, প্রতি ঝুড়িতে কমিশন পঞ্চাশ একশো টাকা করে হলে দিনে হাজার দু-হাজার টাকা ইনকাম। এর জন্য কোনো খরচও নেই। আমাদের মাজদিয়া গ্রামের চাষিদের মধ্যে একতা আছে বলে তাদের জায়গাটা দখল হয়ে যায়নি এখনও।

তবে বাজারে চাষিদের একেবারে জায়গা থাকবে না, এটাও ঠিক না। আবার শুধু চাষি থাকলেও বাজার চলবে না।

মৌমাছি পালন ...

... না করলে মধু নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। কিন্তু কীভাবে মৌমাছি পালন করবেন! অরণ্য কোথায়? মৌমাছি কী খাবে! ফুল কোথায় — সর্ষে হয়ত তিনবার চাষ হয়, কিন্তু কার্তিক মাসের পরে ওরা কী খাবে? একটি বাক্স থেকে যদি বছরে তিন কেজিও মধু পাওয়া যায়, তো বছরে ন–মাস মৌমাছির বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এমন যাযাবর মৌমাছি পালনকারীদের যাযাবর জীবনের কথা শোনা গেল মৌমাছি বাজারে গিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ মৌমাছি বাজার বসেছিল ১ জুলাই ২০১২ রবিবার গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন শ্রীচৈতন্য স্কুল মাঠে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মৌ পালনকারীরা এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মানুষরাও।

গবেষকদের কাছে শোনা গেল কৃষিক্ষেত্রে কৃষিবিষের ব্যবহার আর মৌমাছিদের জীবনে সংশয়–সংকটের কথা। অপরদিকে ফসলের পরাগমিলনের আশি শতাংশ মৌমাছিদের দ্বারা হতে পারে, যার অর্থমূল্য অপরিসীম। এর জন্য দরকার কৃষিকাজের সাথে মৌমাছি পালন সংগঠিত করা। এত কষ্টের পর যখন মৌমাছি পালনকারীরা মধু বড়ো বড়ো কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় এবং তারাই মধু মার্কেটিং করে মুনাফা লোটে, আর সারা বছর ধরেই ওই মানুষগুলো খেটে মরে, একথা মধুর ঠেকে না।

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের (৯৪৭৪১৯২৭৯৯) উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গের মৌমাছি পালকদের পঞ্জিকরণ (নথিভুক্তকরণ)' বেশ লাগল। সর্বোপরি এমন ব্যতিক্রমী বাজারের আড়ম্বর চোখে লাগার মতো।

এই বাজার ঘুরে দেখে এলেন বঙ্কিম, অমলেন্দু, স্বপন

'এবার পানি ফলের কী হবে?'

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ১০ জুলাই •

ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের নানা বিষয় নিয়ে ভাবনা–চিন্তা করতে শোনা যায়। অনেক সময়ই তা যেমন অতি হালকা ও চটুল বিষয় হয়, অনেক সময় আবার তা অনেক গভীর কোন বিষয় হতে পারে। নিত্যযাত্রী হিসাবে আমাকেও তা অনেক সময়ই ভাবায়। বেশ কয়েকদিন ধরে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের বেশ দুশ্চিন্তা এবার পানিফলের কী হবে? শান্তিপুর–শিয়ালদহ মেইন লাইনে কালীনারায়ণপুর জংশন বলে যে স্টেশনটি আছে তার আশেপাশে ছিল প্রচুর জলাজমি। কয়েকশো বিঘা ওই জমিতে বর্ষার মরশুমে যে জল জমত, তেমন তেমন তাতে ফলত সুস্বাদু পানিফল। তিন প্যাকেট প্রায় ৫০০ গ্রাম, ৫ টাকায় বিক্রি হত দেদার।

চাষিজীবী মানুষ যেমন এই মরশুমে পানিফল বিক্রি করে দুটো পয়সার মুখ দেখত, তেমনি এই লাইনের অধিকাংশ হকার এ সময়ে অন্যান্য পসরা সরিয়ে রেখে পানিফল বিক্রি করে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন করে নিত। এবছর আর খুব বেশি পানিফলের চাষ বেশি করা যায়নি কারণ 'কালীনারায়ণপুর' জংশনে পূর্বরেল বিরাট কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করল। রেলের ওই সমস্ত জমি মাটি ফেলে ভরাট করে দিয়েছে। তার জন্য যেমন এবছর আমন, বোরো ধান চাষ হয়নি তেমনি পানিফলের চাষও করা যায়নি।

ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের এবার সস্তায় পানি ফল খাওয়ার আর কোনো আশা রইল না। ট্রেনের আলোচনায় জানা গেল, শিয়ালদহ মেন লাইনে একমাত্র 'কালীনারায়ণপুর' স্টেশনের চত্বরে ও হাওড়া লাইনের সাঁতরাগাছিতে পানিফলের প্রচুর চাষ হয়। কালীনারায়ণপুর অঞ্চলের অনেক চাষি এই সময়টাতে অন্যান্য ফসল ফলানো বন্ধ রেখে পানিফলের চাষ করত। এমনও শোনা গেল রেলের ওই সমস্ত জমি যার যার দখলে থাকত তাদের অনেকে আবার মোটা টাকার বিনিময়ে এই মরশুমে ওই জমি কোনো চাষিকে লিজও দিয়ে দিত। রেলের উন্নয়নে এবার সবই বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থকরী এ জাতীয় ফলচাষে সরকার কেন উৎসাহ দেখায় না! সে প্রশ্নও উঠে এল ট্রেনের আলোচনায়।

টাইমকলের মুখ লাগাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা

কাশীনাথ রায়, শান্তিপুর, ৭ জুলাই •

প্রতিবছর রায় কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা ৫ জুন থেকে এক মাস পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবছরও তা চলছে। আগামী ১৪ জুলাই শান্তিপুর পৌর অঞ্চলের ২৩টা ওয়ার্ডের মধ্যে ৭–৮টা ওয়ার্ডে আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী জলের কলের মুখ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছি। দেখা যাচ্ছে, ২৮টি কলের মুখ কোনোটা ভাঙা, কোনোটা নেই। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা চিন্তার ব্যাপার। যেভাবে ভৌমজলের স্তর দিন–কে–দিন নেমে যাচ্ছে আর যেভাবে পানীয় জলের সমস্যা হচ্ছে, সেখানে জল অপচয়টা মারাত্মকভাবে হচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জন্য আমরা সামনের ১৪ জুলাই কলের মুখ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা দুভাবে কাজটা করব। যে ২৮টা কলের মুখ আমরা চিহ্নিত করেছি, যতগুলো পারি কলের মুখ আমরা কিনব এবং শান্তিপুর পৌরসভার কাছে আবেদন করব, তারা যেন আমাদের সেই কলের মুখগুলো লাগানো এবং যতটা সম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ করার অনুমতি দেয়। এর পাশাপাশি আমরা তাদের কাছে আবেদন করব, বাকি এলাকায় যেখানে এভাবে জল পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যেন কলের মুখ লাগায় এবং যে কলগুলোর প্রয়োজন নেই সেগুলো সেই অঞ্চলের মানুষের অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এরকম উদ্যোগ আমরা অন্য বছরেও নিয়েছি।

মোমের পুতুলেরা নেচে গেল

বিজন কাহালী, বেহালা, কলকাতা, ৬ জুলাই •

২৭ জুন বেহালা শান্তি সংঘ শিক্ষামন্দির গার্লস হাইস্কুলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছিল অনুষ্ঠানটির আয়োজক। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী কাজল ভট্টাচার্য। তবে দর্শকদের মুগ্ধ করে এই বিদ্যালয়ের ছোটো ছোটো ছাত্রীদের আবৃত্তি, নজরুলগীতি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীদের পরিবেশিত 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়' গানের সঙ্গে নাচ সত্যিই প্রশংসা দাবি করে। নাচের শিক্ষক শ্রী সন্তোষ অধিকারীর অনলস পরিশ্রমে পরিবেশনায় লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদ পোশাক পরা ছোটো ছোটো মোমের পুতুলগুলির স্নিগ্ধ আলো যেন দর্শকদের মনকে আলোকিত করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী টিংকু চক্রবর্তীর আন্তরিক উদ্যোগও ধন্যবাদার্হ।

চওড়া হবে বজবজ রোড, বসবে জলের পাইপ দোকান ভাঙার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা আদালতে

অমিতা নন্দী, মহেশতলা, ১৫ জুলাই •

বজবজ রোড (জিনজিরা বাজার থেকে অছিপুর অবধি) ব্যবসায়ী উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তরফে হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। জিনজিরা বাজার থেকে বজবজ রোড সম্প্রসারিত করে ১৫ মিটার করার যে প্রচেষ্টা তার প্রথম ধাপে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে জিনজিরা বাজার থেকে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়। কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া এবং উপযুক্ত লিখিত নোটিশ ছাড়া এই কাণ্ডটি সংঘটিত করা হয় মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে। এর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ কমিটি আইনি লড়াইয়ের পথে যায়। মামলা হয় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে আরও একটি বিষয় সামনে চলে আসে — বজবজ থেকে জলের পাইপ বসানোর কাজ ও সেজন্য দোকান ভাঙা। বজবজ থেকে যখন পাইপলাইন বসানো হয়েছে তা রাস্তার ধারেই বসিয়েছে। কিন্তু শ্যামপুর (ইডেন সিটি মহেশতলার কিছু আগে) থেকে মহেশতলা পুরসভা অঞ্চলে ঢোকার সময়ে দেখা গেল বেশ কিছু দোকান ভাঙা শুরু হল। সিএমডব্লু–র স্থানীয় কন্ট্রাক্টরা বলেছিল দোকান তারা ভাঙবে না। কিন্তু মহেশতলার চেয়ারম্যান তা মানেননি। ফলে মাসখানেক আগে যখন শ্যামপুর ও ডাকঘরের কাছে জালখুরা স্কুল অবধি দোকানপাট ও একটি ক্লাবঘর ভেঙে দেওয়া হয়, দোকানদাররা বাধা দেয়। এখন সেখানে কাজ আটকে আছে।

ফলে ব্যবসায়ী উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি হাইকোর্টে আবার দ্বিতীয় একটি মামলা শুরু করে।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ঘরে উপরোক্ত দুটি মামলারই শুরু হয়েছে জুন মাসের শেষ শুক্রবার। প্রধান বিচারপতি সরকারপক্ষকে ১৫ দিন সময় দিয়েছেন তাদের সমস্ত ডকুমেন্ট, নোটিফিকেশন ইত্যাদি কোর্টে দাখিল করার জন্য। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীদের যিনি আইনজীবী তাঁকেও বলেছেন এযাবৎ তাঁরা যেসমস্ত চিঠিপত্র, নোটিশ ইত্যাদি দিয়েছেন সেসব কিছুর কপি আবার সার্ভ করতে।

গত ১৩ জুলাই শুনানির দিন ছিল। কিন্তু শুনানি হয়নি। আরও এক সপ্তাহ সময় বাড়ানো হয়েছে।

আকড়া হাই মাদ্রাসায় আলোচনা

অদৃশ্য রশ্মির বিকিরণ ও তার প্রভাব

জিতেন নন্দী, আকড়া, ১৫ জুলাই •

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে এবং তিনদিন পর ৯ আগস্ট নাগাসাকি শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা বর্ষণ করে। সেই বিস্ফোরণের দিনই হিরোশিমার আড়াই লক্ষ এবং নাগাসাকির সত্তর হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, আজ পর্যন্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিস্ফোরণের ভয়াবহ ফলাফল বয়ে বেড়াচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যাপী জাপান তথা বিশ্বের মানুষ। এরপর আমেরিকা ছাড়া আরও বহু রাষ্ট্র পরমাণু বোমা তৈরি করেছে; বহু দেশে মাটির নিচে এবং মাটির ওপরে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশে দেশে শান্তির আবেদনকে অগ্রাহ্য করেছে অবুঝ রাষ্ট্রশক্তি। যে জাপানে হিরোশিমা–নাগাসাকির মতো ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য একের পর এক মোট ৫৪টা পরমাণু চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। ১১ মার্চ ২০১১ এই পরমাণু উন্মাদনার ওপর প্রবল আঘাত আসে। প্রবল ভূমিকম্প ও সুনামির সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ফুকুশিমায় সাঙ্ঘাতিক পরমাণু বিপর্যয় ঘটে। এই ঘটনায় দারুণ বিপর্যস্ত জাপানের আপামর মানুষ আজ পরমাণু শক্তি থেকে অব্যাহতি চাইছে।

আমাদের দেশেও রয়েছে পরমাণু বোমা এবং পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির কর্মসূচি। ফুকুশিমা পরমাণু বিপর্যয়ের পর যখন সারা পৃথিবী পরমাণু শক্তির হাত থেকে মুক্তি চাইছে, তখন তামিলনাড়ুর কুডানকুলাম সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করার আয়োজন চলছে।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জানা দরকার, পরমাণু শক্তি কী? তার যে অদৃশ্য রশ্মির বিকিরণ, আমাদের ওপর তার কী প্রভাব? আমরা প্রতিদিন যে মোবাইল ফোন, টিভি, এফএম রেডিও ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেই সূত্রে আর কী কী ধরনের অদৃশ্য রশ্মির বিকিরণের প্রভাব আমাদের ওপর রয়েছে?

১৪ জুলাই ২০১২ শনিবার মহেশতলা অঞ্চলের আকড়া হাই মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের দুটি ক্লাস নেন বিজ্ঞানী শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় দুশো জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। সমস্ত ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের যথেষ্ট আন্তরিকতার ছাপ ছিল। বিশেষ করে মোবাইল সংক্রান্ত মাইক্রোওয়েভ রশ্মির বিকিরণ নিয়ে আলোচনাটি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ছাপ ফেলে। প্রশ্নোত্তর পর্বের পরেও ছাত্ররা এগিয়ে এসে শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কাছে নানা প্রশ্ন করে।

মোবাইল বিকিরণ নিয়ে আলাপ শান্তিপুরে

শ্রীমান চক্রবর্তী, শান্তিপুর, ৮ জুলাই •

আজ বিকেল তিনটে থেকে শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমি স্কুলের হলঘরে রায় কোচিং সেন্টারের ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও তাদের বন্ধুজনদের উদ্যোগে মোবাইল টাওয়ার ও মোবাইল ফোনের বিকিরণ ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। দুপুরের মুষলধারার বৃষ্টিতে অনুষ্ঠান শুরু হতে একটু দেরি হলেও প্রায় শতাধিক ছাত্র–ছাত্রী সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সময়ের অভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানে কিছুটা কাঁটছাট করা হলেও ছোট্ট কিশোর উজান চট্টোপাধ্যায়ের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলে সকলেই মোহিত হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে মোবাইল টাওয়ার ও মোবাইল ফোনের বিকিরণ ও তার প্রভাব নিয়ে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের বায়ো ফিজিক্সের বিজ্ঞানী শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।

মোবাইলের প্রভাব নিয়ে আলোচনার শুরুতেই তিনি জানিয়ে দেন তাঁরও নিজস্ব একটি মোবাইল আছে। আলোচক প্রোজেক্টারের সাহায্যে মোবাইল টাওয়ার ও মোবাইল ফোনের বিকিরণের বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেন। মোবাইল টাওয়ার থেকে এবং একজন মোবাইল ব্যবহারকারী হিসাবে আমরা কী কী ভাবে নিজেদের সচেতন রাখব সেই প্রশ্নগুলিই আলোচনার শেষে উঠে আসে। আলোচনার শেষে মোবাইল টাওয়ার ও তার বিকিরণের কী প্রভাব আমাদের পরিবেশের ওপর পড়ে সেই প্রশ্ন উঠে আসে ছাত্র–ছাত্রীদের তরফে । সময়ের অভাবে আলোচনার শেষে প্রশ্ন–উত্তর পর্ব বেশিক্ষণ চালানো না গেলেও উৎসুক ছাত্র–ছাত্রীদের তাদের প্রশ্নগুলি একত্র করে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানানো হয়, এবং সেই উত্তর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলেও আশ্বস্ত করা হয়।

প্রস্তাবিত পরমাণু জ্বালানি অঞ্চলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রাওয়াতভাটায়

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুলাই, দি হিন্দু পত্রিকা থেকে •

রাজস্থানের কোটা শহরের কাছে রাওয়াতভাটায় একটি প্রস্তাবিত 'পরমাণু জ্বালানি এলাকা' বা 'নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স'–এর জন্য জনশুনানিতে সাধারণ মানুষ পরমাণু চুল্লি ও জ্বালানি এলাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। এই কমপ্লেক্সটি গড়ে তোলা হচ্ছে গুজরাত এবং রাজস্থানে আসন্ন চারটি ৭০০ মেগাওয়াটের পরমাণু চুল্লির জন্য। রাওয়াতভাটা ফুয়েল কমপ্লেক্সটির বছরে ৫০০ টন পরমাণু জ্বালানি তৈরি করার কথা। এই কমপ্লেক্স তৈরির আগে এর জন্য পরিবেশ জনশুনানির আয়োজন হয়েছিল ১২ জুলাই। এই জনশুনানিতে এসে প্রকল্পের 'পরিবেশের ওপর প্রভাব সমীক্ষা' রিপোর্টকে 'অসত্যের লিপি' বলে বর্ণনা করেন ডাক্তার সঙ্ঘমিত্রা গাদেকর।

এর আগে ১৫ জুন হাজার হাজার গ্রামবাসী এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল। তাদের প্রতিবাদ ছিল প্রস্তাবিত জ্বালানি প্রকল্প এবং পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে। জনশুনানিতেও গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্তত ছ–জন বলেন, সেই ১৯৭৩ সালে রাওয়াতভাটার প্রথম চুল্লির সময় থেকে কখনোই গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। ২৩ জুন রাওয়াতভাটায় একাধিক ঠিকা শ্রমিক বিকিরণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন, নন্দকিশোর মেহর অভিযোগ করেন, তার মূত্র পরীক্ষার রিপোর্টও তাকে দেওয়া হয়নি। অনেকেরই ভয়, এই জ্বালানি এলাকার জন্য যখন ইউরেনিয়াম নিয়ে যাওয়া হবে ট্রাকে বা ট্রেনে চাপিয়ে, তা থেকে এলাকার একমাত্র নদী চম্বলে দূষণ ছড়াতে পারে।

জনশুনানিতে রাওয়াতভাটা পরমাণু চুল্লির কিছু দালালদের রাখা হয়েছিল বক্তব্য রাখার জন্য, যাদের অধিকাংশই একসময় চুল্লিতে কাজ করেছে, এখন বিল্ডিং সামগ্রীর কন্ট্রাক্টারি করে। তারা জ্বালানি এলাকার পক্ষে বক্তব্য রাখে।

কুডানকুলামের দূরবর্তী গ্রামে 'আপৎকালীন পরমাণু মহড়া' একটি ভাঁওতা, জানাল তথ্যানুসন্ধানী দল

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুলাই। পুরো রিপোর্টটি পাওয়া যাবে http://khobordar.com/wp-content/uploads/2012/07/Nakkaneri-Nuclear-Fact-Finding-Report-Final.pdf •

পরমাণু চুল্লি চালু করার আগে আশেপাশের এলাকায় একটি 'আপৎকালীন পরমাণু মহড়া' করতে হয়। তা নাহলে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সির নিয়মে পরমাণু চুল্লি চালু করা যাবে না। চুল্লিতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে যেন আশেপাশের লোকজন পালিয়ে যেতে পারে খুব দ্রুত, তার প্রস্তুতি হল এই মহড়া। এই মহড়া দেওয়াতে গিয়েই কুডানকুলামে সাম্প্রতিক পরমাণু বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল একবছর আগে। সেই আন্দোলনকে আপাতত প্রায় এক লক্ষ মামলা দিয়ে অগ্রাহ্য করা গেলেও, মহড়াটি তো করতেই হত। সেই মহড়ারই আয়োজন হয়েছিল গোপনে, কুডানকুলামের পরমাণু চুল্লির ৭ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম নাক্কানেরিতে, ৯ জুন ২০১২ সকালে।

মহড়া কেমন হয়েছে, তা সরেজমিনে জানার জন্য সেই গ্রামে 'পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিস'–এর একটি প্রতিনিধিদল যায় ১৩ এবং ২০ জুন। তারা সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার নেয়, তাদের স্বাক্ষরিত বয়ান নেয় এবং ভিডিওগ্রাফি করে। সেই বয়ানে জানা যাচ্ছে, গ্রামবাসী বা তাদের প্রতিনিধি, কাউকেই বলা হয়নি যে এটি দূরবর্তী কোনো জায়গায় পরমাণু দুর্ঘটনা হলে কী করতে হবে, তার মহড়া। পরমাণু কর্তারা এসে গ্রামে কয়েক ঘন্টা ছিল। তারপর তারা ফিরে গিয়ে প্রেস বিবৃতি দেয় — আপৎকালীন পরমাণু মহড়া হয়ে গিয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানায়, এই গ্রামে ১৫০টি ঘর, ৫০০ জন মানুষের বাস, বেশিরভাগই দলিত পারাইয়ার জাতের। তাদের বেশিরভাগই পাশের বায়ুকল, ফার্ম, মৎস্যচাষ প্রভৃতি কাজে বেরিয়ে যায় সকালে, ফেরে সন্ধ্যেবেলা। আগে থেকে না জানলে গ্রামে এসে কেবল বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পাওয়া যায়। ৯ জুন এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে কিছু লোক এসেছিল গ্রামে। তারা চায়ের দোকানে বসে চা খেয়েছে, আর ফাঁকা রাস্তার ছবি তুলেছে। লোকে ভেবেছে, রাস্তাটা চওড়া হবে, তাই ছবি তুলছে। গ্রামের একজন বুড়ো লোক আরুমুগাম, জিজ্ঞেস করে, রাস্তা তো করবে পঞ্চায়েত, পুলিশ তো করবে না! তখন তাকে ভাগিয়ে দেয় পুলিশ। কাউকে কাউকে পুলিশ বলে, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিতে এসেছি। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যরা কানাঘুসো শুনেছিল, পরমাণু কর্তারা আসছে, কিন্তু কেন আসছে তারা শোনেনি। তাদের সঙ্গেও নেয়নি পরমাণু কর্তারা।

তথ্যানুসন্ধানী দলটি দাবি জানিয়েছে, ওই মহড়া আইন মেনে হয়নি, তাই তা বাতিল করা হোক।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 2 16 July 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

অটলের মৎসপুরাণ

তমাল ভৌমিক, ভবানীপুর, ১০ জুলাই •

জগুবাজার বাসস্টপের উল্টোদিকের ফুটপাথে লালুর চায়ের দোকানে অটলের সাথে দেখা। সে ঘুগনি রুটি খাচ্ছে। আমাকে বলল, টিফিন খাচ্ছি। আমি বললাম এত বেলায়! সকাল থেকে খালি পেট? তোমায় না গ্যাসট্রিকের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। অটল বলে, না দাদা, সকালের দিকে একবার ১০০ গ্রাম ছাতুর শরবৎ খেয়েছি। তাছাড়া মাঝেমাঝে দুধছাড়া চা, সুগার আছে তো; আলাউদ্দিনেরও আছে। আলাউদ্দিনের মুখোমুখি বসে ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার, সংক্ষেপে জগুবাজারে মাছ বেচে অটল। অটল সর্দার, বয়স ৫০ পেরিয়েছে। বেলা পৌনে বারোটা। এখন সাইকেল চালিয়ে সে যাবে জুলপিয়া থেকে আরও ২ কিমি ভেতরে কৃষ্ণনগর গ্রামে। এখান থেকে ২ ঘন্টা সময় লাগবে যেতে। সকালে আসার সময় সে কবরডাঙ্গা থেকে মাছ তোলে। ওখানে পাইকারি বাজারে মাছ আসে ডায়মন্ড হারবার থেকে, মালঞ্চ থেকে এমনকী দীঘা থেকেও। সাত–আটটা ব্যাগে পাঁচ–ছ রকম মাছ, ২০ থেকে ৩০ কিলো, রোজ আনে। সবরকম মাছে সমান লাভ থাকে না। ঘরে ১০ থেকে ১৫ টাকা কিলোতে লাভ — – চিংড়িতে একটু বেশি, পোনামাছে সবচেয়ে কম। রোজ সব মাছ বিক্রি হয় না। বাকি মাছ বাজারে বরফ চাপা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। বরফের জন্য রোজ ৪০–৫০ টাকা খরচ হয়। দৈনিক ভাড়া ৬টাকা ৭৫পয়সা। বাজার সমিতিকে ২টাকা করে রোজ অটলকে দিতে হয় নিজের বসার জায়গাটুকুর জন্য। অটল নিচে বসে। আর মাছের বাজারের উঁচু রকে অটলের দাদুর আমলের একটা জায়গা আছে। সেখানেই প্রথম দাদুর সাথে মাছ বেচতে এসেছিল ১৯৭০ সালে — তখন সে সবে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে। সেই জায়গাটায় এখন কেউ বসে না, যদিও অটলকে তার জন্যে একই হারে ৬ টাকা ৭৫ পয়সা করে দৈনিক দিতে হয়। আর তাছাড়া এই দুটো জায়গায় মাছ বিক্রির লাইসেন্স ফী বাবদ বছরে ৫৫০ টাকা করে দিতে হয়।

তবু অটল জায়গাটা বেচবে না। ঘুগনিতে পাঁউরুটি ডুবিয়ে সে আমায় বলে, বুঝলেন দাদা, দাদুর স্মৃতি তাই রেখে দিয়েছি। আমি বললাম, পরে কোন কাজে লাগতেও পারে। অটল মাথা নাড়ে, নাঃ, ছেলেকে বলেছিলাম, সে বলেছে মাছের ব্যবসা করবে না। আমার ভাই পাঁচু যে আমার পাশে বসে মাছ কাটে ওরও তো নিজের জায়গা ওটা। কিন্তু জগুবাজারে মাছ বিক্রি অনেক কমে গেছে। এখানে সব নন–বেঙ্গলি ব্যবসায়ী এসে পুরোনো বাড়িভাঙ্গা–ফ্ল্যাটগুলো দখল করেছে। তারা আবার মাছ খায় না। ছেলেকে তাই অটো কিনে দিয়েছে অটল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে ছেলে আর কিছু কাজ পেল না। এখন সে ছেলে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা আর বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অটো চালিয়ে দিনে ২৫০–৩০০ টাকা ইনকাম করে। তবে বেশিদিন করবে না। ওদের ওখানে স্টুডিয়ো (সিনেমার শুটিং–এর) যে জায়গায় তৈরি হচ্ছে তার পাশে অটলের জমি রাখা আছে, ইচ্ছে আছে সেখানে ছেলের জন্য একটা দোকান করে দেবে।

গল্প করতে করতে অটল বলে – বিঘে তিনেক জমি আছে আমাদের – বাবা কাকাদের একসঙ্গে পরিবার। কাকারা দুজন চাকরি করত একজন রিটায়ার্ড, একজন এখনও খিদিরপুর ডকে কাজ করে। ওই জমির ধানে আমাদের সারাবছর চলে যায়। কিছু তরকারিও লাগিয়েছি — পুঁইশাক, নটেশাক। এইতো এখন টিফিন খেলাম। বাড়ি পৌঁছাবো আড়াইটের পরে। তারপর খেয়েদেয়ে বিকেলে মাঠে গিয়ে কোদাল মারব। তরকারী আমাদের কিনতে হয় না। এতেই কোনরকম চলে যাচ্ছে। হাই–ফাই লোকেদের সাথে মিশি না। মাঝারি মাপের লোকেদের সঙ্গে ওঠা–বসা। একদিন চলুন না দাদা।

আমি জানি, অটল আগে খুব বাংলা খেত। সন্ধ্যাবেলা তো বটেই, সকালেও মাছ বেচতে বেচতে মুড়ির সঙ্গে প্লাস্টিকের জলের বোতলে বাংলা খেতে খেতেই ওর সাংঘাতিক পেটের রোগ হয়েছিল। মাসখানেক হাসপাতালে কাটিয়ে এখন বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে মদ খাওয়া। জিজ্ঞাসা করি — সন্ধ্যাবেলা কী করো অটল? বলল, তরকারি বাগান থেকে ফিরে টিভি দেখি। রাত ৯টা অবধি। তারপর খেয়েদেয়ে শুতে রাত ১০ টা। আবার ভোরবেলা সাড়ে তিনটেয় রেডি হয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোতে হয়। আজকাল অবশ্য খুব মুশকিল হয়েছে। দুঘন্টা–দুঘন্টা সাইকেল চালিয়ে শহরের উপকণ্ঠ থেকে এসে মাছের ব্যবসা করে অটল ম্যাটাডোরের আশি টাকা ভাড়া বাঁচাত। কিন্তু ইদানীং পুলিশ খুব ঝামেলা করছে। অটল বলে – কদিন আগে এই তো রাসবিহারীর কাছে রাস্তার ওপারে যাব। টিফিন খাওয়া হয়নি। ওখানটায় চাউমিন বিক্রি করছে। ভাবলাম হাফ–প্লেট চাউমিন খাব। হঠাৎ পুলিশ এসে ধরল। ১০০ টাকা ফাইন দিতে হবে। আঙ্গুল তুলে দেখালো রাস্তার ধারে বোর্ডে লেখা আছে সাইকেল চালানো নিষেধ। আমি বললাম — এত সব মালপত্তর বোঝা নিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি; আমি কি রাস্তা দেখব না সাইনবোর্ড দেখব — অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে না? কোনো কথা শুনবে না। একশো টাকা দিতে হবে। আমি বললাম — এই দেখুন আজ একশো তিরিশ টাকা লাভ হয়েছে, মাছের কাঁটা আর আলু কিনেছি, ব্যাগে আছে দেখুন, আপনাকে একশো টাকা দিলে হাতে কী থাকবে? কোনো কথা শুনল না, একশো টাকা নিয়ে ছাড়ল। আমি হচ্ছি গিয়ে ধরা পড়াদের মধ্যে ৫০ নম্বর, ৫০ নম্বর লেখা কাগজ দিল। এর আগে ধরা পড়া ৪৯ জনের দু–একজনকে চিনি — মাছের আঁশপাশ কুড়ায় জগুবাজারে। তাদের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। একশো টাকাও দিতে পারল না, শেষে বাড়িতে ফোন করল টাকা পাঠানোর জন্য।

দুঃখের গল্প শেষ হওয়ার পর সুখের গল্প। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমেছে। দোকানের তেরপলের তলায় দাঁড়িয়ে অটল আমায় খবর দিতে থাকে — ওর মেয়েটা ভালো, একটা ছেলের পর একটাই মেয়ে, ক্লাস টেন থেকে ইলেভেনে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য খবর — অটল কুড়ি বছর তবলা শিখেছে। এখন ও নিজের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা সাত–আটজনকে তবলা শেখায়। তাতেও কিছু ইনকাম হয়। মেয়েকেও কিছুদিন গান শিখিয়েছিল, এখন পড়ার চাপে গান সে বন্ধ রেখেছে। ছেলেও নাকি স্কুলে গিয়ে বেঞ্চি বাজাত। মানে ওদের পরিবারে সংগীতের রেওয়াজ আছে। বৃষ্টি কিছু ধরে আসায় উঠব উঠব করছি, বললাম অটল তোমার ছাতা আছে? অটল বলল, না দাদা, ছাতা হাতে সাইকেল চালানো যায় না। তাছাড়া সঙ্গে মাছের থলে থাকে। অতখানি রাস্তা একহাতে চালানো যায়? আমি ভিজেভিজেই যাতায়াত করি, অসুবিধা হয় না। শুধু বেশি গরমে একটু কষ্ট। আমি তখন উঠে আসছি, অটল সমানে বলে যাচ্ছে, যাবেন কিন্তু দাদা বৌদিকে নিয়ে, একটা ছুটির দিন দেখে, বাজারের কাউকে বলতে হবে না, সব তো শিক্ষার ঢিপি, খিস্তি ছাড়া কথা জানে না। আমি একটু হেসে ফিরে আসতে আসতে ভাবছি, বহুদিন হল অটলের থেকে মাছ কিনি না। ওর একটু ওজনে মারার স্বভাব আছে। বাজারের যে দিক দিয়ে ঢুকি তার মুখে অটল বসে। রোজই ডাকে। কিন্তু আমি কখনো পাত্তা দিই না। অথচ আমাকে ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করায় আন্তরিকতার কোনো অভাব তো নজরে পড়ল না। লজ্জা পাব কি?

ফলতার গ্রামে উচ্চশিক্ষার হকিকত

পার্থ কয়াল, ফলতা, ১৫ জুলাই •

মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক দুটো পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। গ্রামের দিকে পাশ করাটা বড়ো ব্যাপার। আর পাশ করার পর আবার পড়তে ভর্তি হওয়াটাও। বেশিরভাগ জানে তাদের সরকারি চাকরিবাকরি কিছুই জুটবে না। তাই যত অল্প বয়সে কাজে ঢোকা যায় ততই ভালো। কাজের অভিজ্ঞতা বাড়বে, সাথে মাইনেও বাড়বে। সাধারণভাবে হিন্দু ঘরের ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কাঁচের জানলা ফিটিং, প্যানেল উইন্ডোর কাজ, হোসিয়ারিতে কাজ, পাশের ফলতা সেজের কাজ সাথে ফাঁকেতে সবজি চাষ, ধানের মরসুমে ধান চাষে হাত লাগানো, বা কলকাতায় মাঝেমধ্যে জোগাড়ের কাজে আসা, কখনো পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সোনা রূপোর গয়না তৈরির কাজে যাওয়া এসব–ই চলতে থাকে। মুসলিম ঘরের ছেলেরা প্রথাগত ভাবে দর্জি জরির কাজে (এখন জরির কাজের বাজার মন্দা), যারা একটু ডাকাবুকো ধরনের তারা শেল্টারিং–এর কাজে/বড়ো বড়ো বিল্ডিঙের ডাক্টিং–এর কাজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যায়।

হিন্দু ঘরের দুটো ছেলের সাথে গল্প করছিলাম, দুজনের মধ্যে একজনের বাবা কাছেই থাকে, কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই ওদের দেখে না, আরেকজনের বাবার মাথা গরম, কাজে গিয়ে মালিকের সাথেই তর্ক জুড়ে দেয়। দুজন–ই ভেবেছিল আর পড়বে না, অবশেষে স্কুল থেকে পড়ার জন্য হেডমাস্টারমশাই ডাক পাঠিয়ে ভর্তি করেছেন, তা একজনের কাছ থেকে স্কুল টাকা নিয়েছে আর অন্য জনের কাছ থেকে ভর্তির টাকা নেয়নি। প্রথমে স্কুল বলেছিল সায়েন্স সাবজেক্টে ভর্তি হতে, কিন্তু ওরা জানে তাতে পড়ার খরচ আছে, বই চেয়েচিন্তে জুটলেও টিউশনের খরচ চালানো মুশকিল, তাই আর্টসেই ভর্তি হয়েছে। এরকম হাজারো ছেলেমেয়ে আছে যারা ভর্তি হলেও বই কেনার সামর্থ্য নেই, ক্লাসে আসে বসে থাকে গল্প করে আর চলে যায়। কেউ একবছর পড়া ড্রপ দিয়ে কারখানায় ঢোকে, আবার ভর্তি হয়, হেডস্যার বা অন্যদের ধরে কাজ আর পড়া দুটোই চালিয়ে যেতে থাকে।

মুসলিম ঘরের অবস্থা আলাদা কিছু নয়, ক্ষেত্র বিশেষে বরং খারাপ। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশন বা তার কাছাকাছি নম্বর পেয়ে, বাড়ি থেকে বলছে আর পড়াতে পারবে না, এ তো আকছার ঘটছে। ধরা যাক একটি বাড়ির ইনকাম বলতে সম্বৎসরের চাষ — বোরো আর আমন, ছাগল পেলে দুধ বিক্রি, ছাগল বড়ো করে বিক্রি, হাঁস–মুরগির ডিম বিক্রি, সময়ে নারকোল বিক্রি, নারকোল পাতার থেকে কাঠি বিক্রি, কখনো জরির কাজ এসব করেই চলে তিনজনের সংসার – — বাবা, মা, ছোটো ছেলে। বড়ো ছেলের পাশেই আলাদা সংসার। তিনজনের সংসারে ডেলি মুদি দোকানের খরচ গোটা চল্লিশ টাকা, তা সামলে পড়ার খরচ কোনোদিন ছোটো ছেলে বাড়ি থেকে হাত পেতে নেয়নি, পুরোটাই সেই ছোটো থেকে এর–ওর কাজ করে জোগাড় করেছে। এই সেদিনও বর্ষা নামার আগে অন্যের পুকুরে মাটি কেটে তিনদিনে আয় করেছে ৪৫০ টাকা, তারপর বৃষ্টি নামায় কাজ বন্ধ। এদিক সেদিক থেকে টাকা ধারধোর করে কলেজে ভর্তি হওয়া, সেখানে কলেজ কোনো কথা শুনতে রাজি না (যদিও শোনা যায় নাকি কেউ আর্থিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে কলেজ ফি মকুব করবে বা কমাবে — সাধারণভাবে পাশ কোর্সে আর্টস–এ ভর্তি হবার জন্য এককালীন ৯৫০ টাকা লাগছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে)। ক্ষেত্র বিশেষে ছেলেরা যদি বদমাইশি করে টাকা না দেয় সেই ভয়ে আবার কোনো কলেজে ভর্তির কিছু টাকা বাকি রাখলে, পরে সেই ছাত্র যাতে না পালায় সেজন্য মুচলেকা লেখাচ্ছে। একটি ছেলের বাড়ি এমন জায়গায় সেখান থেকে কলেজে আসতে যাতায়াতে খরচ পড়ে ডেলি ২০ টাকা। ৫ টাকা হাত খরচ ধরলে ২৫ টাকা। সপ্তাহে দুদিন আসলে ৫০ টাকা, আর দু–একটা বই কেনার খরচ ধরলে (সমস্ত বই কেউ কেনে না) সাধারণত একটা পাড়ায় যারা এক–দুজন ভর্তি হল তারা কয়েকজন মিলে একই কম্বিনেশন নেয় যাতে একজনের টিউশনের খরচে বাকিদের চলে যায়। তাতেও সামলে ওঠার জন্য দলিজে সারা সপ্তাহ কাজ করতে হয়।

মুসলিম পরিবারের একটি মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক ভালোভাবে পাশ করল, তারপরও পড়ার ইচ্ছে, কিন্তু পড়ার পথে বাধা হয় টাকা জোগাড় করা, যদি বা ভর্তির টাকার জোগাড় হল, কিন্তু বাড়ির সংসার চালাতে যে জরির কাজ চলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে পড়তে গেলে; আর বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ের গরিবানা ঘরে কি পাত্র জোটে?

খ ব রে দু নি য়া

ওয়ালমার্টের বাতিল দানব–দোকানের বিল্ডিঙে সাধারণ পাঠাগার

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ জুলাই, ছবি ইন্টারনেট থেকে পাওয়া •

ওয়ালমার্ট একটি নামকরা দানবীয় রিটেল চেন কোম্পানি। আমাদের দেশে যে সংগঠিত দোকানদারির পক্ষে প্রায়শই সওয়াল করা হয়, এরা তাদের একটা। সারা বিশ্ব জুড়েই এদের হাজার হাজার বড়ো বড়ো 'দোকান' আছে, যার একেকটির এলাকা দু–তিনটে বড়ো বড়ো ফুটবল মাঠের সমান। আবার অন্য সব ব্যবসার সাথে সাথেই রিটেল ব্যবসারও মন্দা চলছে আমেরিকায়। সেই দানব দোকান ফেলে রেখে ভেগে যাচ্ছে ওয়ালমার্টরা। সেরকমই একটি দোকান খালি পড়েছিল আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের 'গরিব' মানুষের শহর ম্যাকআলেন–এ। সেই বাতিল দানব–দোকানের ফাঁকা একতলা কাঠামোয় একটি লাইব্রেরি বানিয়েছে সেখানকার শহর কর্তৃপক্ষ। সেই লাইব্রেরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার অন্যতম বড়ো একতলা লাইব্রেরি। আড়াইখানা ফুটবল মাঠের সমান বড়ো সেই লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের বিভাগ, বড়োদের বিভাগ থেকে শুরু করে কম্পিউটার ঘর, আড্ডাখানা — সবই আছে। শহরের মানুষও আসছে এখানে, ইন্টারনেটের প্রবল দুনিয়ার ইলেকট্রনিক বইয়ের আকর্ষণ ছেড়ে ছাপা বইয়ের এই পাবলিক লাইব্রেরিতে। আমেরিকার এক প্রান্তিক শহরের সামাজিক মেলামেশার জায়গা হয়ে উঠেছে এই সাধারণ পাঠাগার।

মেক্সিকোতে ভোট চুরির বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ জুলাই, যুবকদের প্রতিবাদের ছবি ইন্টারনেট সূত্রে পাওয়া •

১ জুলাই মেক্সিকোতে সরাসরি রাষ্ট্রপতি ভোটে জিতেছে একটি দল, যারা প্রায় ৭১ বছর ধরে মেক্সিকো শাসন করেছে প্রায় স্বৈরতান্ত্রিকভাবে। এরপর গত ১২ বছর তারা বিরোধীর ভূমিকা পালন করেছিল। দেশটির ভোট বিভাগ জানিয়েছে, এরা পেয়েছে ৩৮ শতাংশ ভোট। বামপন্থীরা পেয়েছে ৩১ শতাংশ ভোট। কিন্তু সে দেশের মানুষের একটা অংশ মনে করছে, এই ভোটে কারচুপি হয়েছে। প্রচুর ভোট কেনা হয়েছে উপহার কুপন, একটি নির্দিষ্ট সুপারমার্কেটের ফ্রি কুপনের বিনিময়ে। তাছাড়া ভোট বিভাগও ভোট গণনায় কারচুপি করেছে। দেশের মিডিয়াগুলিকে পয়সা খাইয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড়ো মিডিয়া গ্রুপ 'তেলেভিসা' সরাসরি বিজেতা পার্টির হয়ে প্রচার করেছে। সবচেয়ে বড়ো পত্রিকা 'এল ইউনিভার্সাল' ভোটের দিনই সকালে পাতাজোড়া খবর প্রকাশ করেছে, ওই 'ইন্সটিটিউশনাল রেভলিউশনারি পার্টি'র প্রার্থীর 'বিজয়'–এর খবর জানিয়ে। এর আগে ২০০৬ সালেও বামপন্থী প্রার্থী অব্রাডরকে জিততে দেওয়া হয়নি, সে এবারের ভোটে তৃতীয় হওয়া দল 'ন্যাশনাল অ্যাকশন পার্টি'র কাছে হেরেছিল এক শতাংশেরও কম ভোটে, যা নিশ্চিতভাবেই রিগিং–এর ফসল বলে অনেকে মনে করে।

এই ভোট চুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক মিছিল হয় মেক্সিকোর ৩২টি রাজ্যের অর্ধেকে। হাজার হাজার যুবক যুবতীরা এই মিছিলে যোগ দেয়। রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে জোকালো প্লাজাতে ৭ জুলাই প্রায় ৫০ হাজার মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল বলে প্রশাসন জানায়।

চলতে চলতে

থেমে

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১৪ জুলাই •

তালতলা লেনের শুরুর দিকটায় অন্ধকার আর পেচ্ছাপের তীব্র গন্ধ। গলিটার থেকে ইউটার্ন নিয়ে বেরিয়ে এস এন ব্যানার্জি রোডে পড়ার আগে ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী স্মৃতি লাইব্রেরি। সেখান থেকে খবরের কাগজের দু–চারজন পাঠক ঝুঁকে আকাশ দেখল। বৃষ্টি নামল। মেঘের তো কমতি নেই, বৃষ্টি কতক্ষণ হয় কে জানে। আষাঢ়ের অর্ধেক পেরিয়ে গেল। এখনও বর্ষা জমল না। একজন বৃদ্ধ পাঠক আরেকজনকে বলেন, 'পলিউশন, বুঝলেন পলিউশনেই সব শেষ হয়ে গেল। আমরাই আমাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছি। বর্ষা হবে কোথা থেকে?'

এই বৃদ্ধর মতোই এপাড়ায় এখনও এমন কতকগুলো বাড়ি বেঁচে আছে, যাদের ঝুল বারান্দার লোহার রেলিঙে ফুল আর লতাপাতার কারুকাজ। মোড়ের মাথায় একদিকে দেবদারু আর অন্যদিকের গাছটা সম্ভবত জারুল। একজন দেহাতি বয়স্ক লোক আমাকে বললেন, ওটা জঙ্গল গাছ, ছোটাসা ফল ভী হয়। আমি সেই আধচেনা গাছের নিচে ছাতা হাতে দাঁড়িয়েছি। টিউশনি বাড়ির দরজা তালাবন্ধ। সন্ধ্যে ৭টা বাজতে ১০ মিনিট বাকি। সময় কাটাতে সামনের ফুটপাথের চায়ের দোকান থেকে একটা চা নিলাম। চারিদিকে দেখছি। উল্টোফুটে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের চাঁদোয়ার নিচে ভুট্টাওয়ালা আগুন বাঁচিয়ে রাখতে এত দ্রুত হাতপাখা নাড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা বড়ো প্রজাপতি যেন তার হাতের মুঠোয় স্থির হয়ে আছে। আমার ফুটে চায়ের দোকানের পাশে নিচু রকে হিন্দুস্থানি খেটেখাওয়া মানুষের ভিড়। তাদের মাথার ওপর টাঙানো কালো প্লাস্টিকে বৃষ্টির জল জমে সাদা সাদা মোটা ধারায় নেমে আসছে। ওরকম মোটাধারার ডোরাকাটা পটে লুঙ্গি আর ফতুয়া বা গেঞ্জি গায়ে মানুষগুলোর হাতে হাতে চা আর খইনি। আবছা আলোছায়ায় কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তারই মধ্যে লাল গামছা কাঁধে একজনের সাদা গোঁফের তলা থেকে অদ্ভুত দেহাতি সুর ভেসে এল। সেই দেহাতি লোকগানে মেঘমল্লারের সুর না থাকলেও মেজাজটা আছে। বাঁদিকে আমার পায়ের কাছে সেই জঙ্গল গাছ থেকে ক–হাত মাত্র দূরে, ইলেকট্রিক পোস্টের নিচে আবর্জনার স্তূপ। সেখানে একটা ভাঙ্গা বাইক ভিজছে। নম্বর প্লেটে লেখা আছে, কলকাতা পুলিশের বাইক তাও লেখা আছে। লাল মাটগার্ডের ফোকলা চাকাদুটো এমনভাবে নোংরার ঢিপির মধ্যে হাঁটুগেড়ে বসে আছে, মনে হচ্ছে মহাভারতের কর্ণের রথের চাকা — রথচক্র গ্রাসিছে মেদিনী। দেখতে দেখতেই বৃষ্টির বল্লম উঠিয়ে আকাশের যোদ্ধারা হাওয়া। আমিও আমার ছাতার ঢালটা গুটিয়ে নিয়ে টিউশনি বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালাম।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.